



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 205 - 210

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘মেঘ ও রৌদ্র’ উপনিবেশবাদের মোড়কে একটি রাজনৈতিক আখ্যান : একটি পর্যালোচনা

অমৃতা রায়

গবেষক

Email ID: amritaroy355@gmail.com

 0009-0000-8458-5584

Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Colonialism,
hegemony,
racial,
psychological,
political
ideology,
superiority,
exploitation,
social system.

Abstract

Colonialism is considered an important concept in the current social system. Although the concept of colonialism has been defined from various dimensions, the main point is somewhere, the rule of the West over the East. Various images and attitudes of this rule and exploitation process have emerged in the writings of writers at different times. Where not only the activities of the foreign ruling class, but also the loyalty of the so-called 'natives', distrust of themselves, servile mentality, silence despite humiliation, and the tendency to accept the exploitation of the strong over the weak reveal the inferiority of the natives. In Gramsci's words, 'hegemony'.

This story will try to explore the extent to which this psychological and political ideology of colonialism has emerged in Rabindranath Tagore's story 'Megh o Roudro' written in the late nineteenth century. The idea of the racial superiority of the colonial class is the reason for the loyalty of the exploited class. This article will attempt to explore whether this seemingly romantic story is worth considering in that context?

Discussion

বহুমাত্রিক অর্থের দ্যোতনা যুক্ত সাম্রাজ্যবাদ (ইম্পিরিয়ালিজম) এর ধারণা বর্তমান সময়ে একটি অতি আলোচিত বিষয়। এই ধারণার ব্যাখ্যা সরলরৈখিক ভাবে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রাসঙ্গিক ভাবেই এই ধারণা সময়ের সাথে সাথে তার রূপ বদলেছে। সাধারণ ভাবে সরল ভাষায় বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যবাদ হল প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের শাসন। ‘ক্লাসিক্যাল ইম্পিরিয়ালিজম’-এ এই ধারণার ব্যাখ্যা যে ভাবে করা হত বর্তমানে তার ধারণা ভিন্ন। মূলত সতের-আঠারো শতক পর্যন্ত যেসব দেশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক দিক দিয়ে ব্রিটেনের আধিপত্যে বা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল তাদের চিহ্নিত করা হত ‘কলোনি’ হিসাবে। এই সমস্ত ‘কলোনি’ গুলি ছিল ব্রিটেনের ‘বসতি উপনিবেশ’। অপরদিকে যে সমস্ত দেশের উপর ব্রিটেন বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে শোষণ কায়েম রেখেছিল সেগুলি হল ব্রিটেনের বাণিজ্যিক উপনিবেশ। যার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশ। সমুদ্র পথকে মাধ্যম করে বিশ্ব সম্পর্কে ইউরোপ উপাত্ত সংগ্রহ করতে

থাকে। কালক্রমে উপাত্তের মাপকাঠিতেই তৈরি হয় তাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। মজার বিষয় কলোনি গুলিকে জয় করার ধারণা তাদের শুধু সামরিক শক্তিতেই সীমাবদ্ধ রইল না, তার প্রসার ঘটল মানসিক পরিমন্ডলে। বিশেষ করে মানসিকভাবে করায়ত্ত করাই যেন প্রধান হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপের কাছে। দেখা যায় রেনেসাঁস পরবর্তী সময় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার যে মূল লক্ষ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার, কলোনিগুলির সম্পদ লুণ্ঠন, এবং খ্রিষ্টবাদ প্রচার তার ঢাল হিসাবে ইউরোপ ব্যবহার করতে থাকে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে। ইউরোপ প্রমাণ করতে থাকে হীন বর্বর পিছিয়ে পড়া পাশ্চাত্যের দেশগুলোর ইউরোপকে প্রয়োজন। ইউরোপের এই অভিসন্ধি সহজেই কার্যকরী হতে থাকে কারণ তারা উপনিবেশিত দেশগুলির মানুষদের মনস্তত্ত্বকে নাড়া দেয় অধিকার করে নেয় তাদের চিন্তা-চেতনাকে, যার ফলস্বরূপ ইউরোপ তথাকথিত ‘নেটিভ’দের শাসিত হওয়ার সক্রিয় সমর্থন লাভ করতে থাকে। সত্তরের দশকের বুদ্ধিজীবী তথা চিন্তাবিদ Edward. W. Said তাঁর ‘Culture And Imperialism’ গ্রন্থে বলেছেন -

“imperialism means thinking about, settling on, controlling land that you do not possess, that is distant, that is lived on and owned by others.”^১

অর্থাৎ, নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও পরাধীনতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি তত্ত্বগত আদর্শই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদের ধারণাকে ভিত্তি করেই উপনিবেশবাদ (colonialism) এর ধারণা গড়ে ওঠে। ইউরোপ মূলত তার বিভিন্ন উপনিবেশের উপর নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম রাখতেই উপনিবেশবাদের সূচনা করে। এই উপনিবেশবাদের ধারণার আলোচনায় বলা যায়, Edward. W. Said এর ‘Culture And Imperialism’ গ্রন্থের থেকে-

“colonialism”, which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory.”^২

লেনিন যাকে বলেছেন, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর। মূলত আঠারো, উনিশ শতক থেকে ইউরোপীয়দের বাণিজ্যিক উপনিবেশগুলিতে তাদের স্থায়ীকরণের প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশবাদ। এমনকি এই স্থায়ীকরণে উপনিবেশক ও উপনিবেশিত উভয়ের মধ্যে একটি মধ্যস্ততার সম্পর্ক তৈরি হয়। যেখানে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই যেন উপনিবেশিত গোষ্ঠী বশ্যতা স্বীকার করে উপনিবেশক শাসকের। কিন্তু ইউরোপ নিজেদের এই শোষণমূলক প্রক্রিয়ায় দেশজর সাথে তাদের পার্থক্য তৈরি করে, জাতিগত, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত দিক থেকে। এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে শীর্ষে। যেখানে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার ভিত্তিই ছিল মূল। এপ্রসঙ্গে ইতালিয় বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদ আন্তোনিও গ্রামসির বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর ‘Prison Note Books’ এ ‘Hegemony’ এর যে ধারণার কথা বলেন, তাতে প্রকাশ পায় সমাজ জীবনের উপর কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক আরোপিত নির্দেশনার উপর জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি। তিনি বলেন -

“the ‘spontaneous’ consent given by the great masses of the population to the general direction imposed on social life by the dominant fundamental group.”^৩

মজার বিষয় এই সম্মতি সেই গোষ্ঠী শোষিত হচ্ছে জেনেও দেয়। গ্রামসি একথাও বলেন, গোষ্ঠীর যে সকল জনগণ সেই সম্মতি দেয় না রাষ্ট্র তাদের উপর আইনিভাবে বল প্রয়োগ করে।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষেত্রে যদি বিচার করি, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যকে মাধ্যম করে পাকাপাকি ভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে আধিপত্য কায়েম করেছে। তার পূর্বে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে কোম্পানি রাজের গোড়া পত্তন। এর মাঝে ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসী ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সময় বাংলা প্রদেশের সূচনা। বলাবাহুল্য এই উপনিবেশিক শাসনের শোষণ যন্ত্রণার মধ্যে বাংলার প্রাপ্তি রেনেসাঁ। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বাঙালি তথাকথিত ‘নেটিভ’ জাতিকে জাতীয়তাবাদী, আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সুবিশাল সাহিত্যকর্মের মধ্যে বারোবাই প্রকাশ পেয়েছে সেই মনন।

যেখানে উঠে এসেছে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা। উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসনের আসল স্বরূপ এবং পাশাপাশি শোষিত বাঙালির মনোভাব। তাদের নির্ভেজাল ব্রিটিশ আনুগত্য ও শোষিত হওয়ার মানসিকতা।

১৩০১ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্প এই ভাবধারায় ভাবিত তেমনই একটি গল্প। জীবনের মেঘ-রৌদ্রের খেলায় আপাত রোমান্টিকতার মোড়কের এই গল্পে রবীন্দ্র মননের রাজনীতি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেই প্রতিফলনে উপনিবেশবাদের ধারণার মধ্য দিয়ে কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তার খোঁজ করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গল্পে অসমবয়সী নর-নারীর জীবন আলোচ্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজ পরিবেশে উপনিবেশবাদের প্রভাব চালচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে। গল্পের শুরুতে নায়ক শশিভূষণ ও নায়িকা গিরিবালার জীবননাট্যে মেঘ-রৌদ্রের খেলাকে পাঠকের কাছে পরিচিত করানোর পর, পরবর্তী পরিচ্ছেদে তাদের দেয় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তাদের ভাবধারা সম্পর্কে জানা যায়, যেখানে রবীন্দ্র নাথ বলছেন -

“গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চা করিত কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা। ...গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্য বিবাহিত এম-এ বি-এল। উভয়ে প্রতিবেশি মাত্র। ...গিরিবালার পিতা এককালে নিজগ্রামের পত্তনীদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবী পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ...শশিভূষণ এম.এ পাশ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোন কর্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাশ্বলে দুটো কথা বলা সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলে চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ঝকুণ্ডিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।”^৪

শশিভূষণ এর এই পরিচয় থেকে তার স্বভাব সম্পর্কে কিছু অনুমান করা যায়। এবং গল্প এগোবার সাথে সাথে তার পার্শ্বি ক্ষীণ দৃষ্টির আসল প্রখরতা সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়।

গল্পে মূলত তিনটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপনিবেশবাদের প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক, নায়ক হরকুমারের জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লাঞ্চিত হওয়ার প্রসঙ্গ। দুই, ইংরেজ ম্যানেজার সাহেবের দ্বারা দেশি নৌকার পালকে গুলিবিদ্ধ করে ছিন্নভিন্ন করা। এবং তিন, জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাহাদুরের দ্বারা জেলেদের জাল কেটে দেওয়া।

উপনিবেশবাদের প্রভাব তৎকালীন সমাজে কী ব্যাপক ছিল তার ব্যাখ্যা তৎকালীন সময়ে যেমন সাহিত্যিকদের লেখায় উঠে এসেছে তেমনি পরবর্তী সময়ে উত্তরউপনিবেশবাদের তত্ত্ব নিয়ে আলোচিত বিভিন্ন তাত্ত্বিকদের লেখায় উপনিবেশবাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। কলোনিয়ালিজমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে পঞ্চাশের দশকের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ফ্রানৎজ ফানোন (Frantz Fanon) তাঁর ‘Black Skin White Masks’ (১৯৫২খ্রিঃ) কলোনিয়ালিজমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন। যেখানে তিনি বলেন -

“It examines how colonialism is internalized by the colonized, how an inferiority complex is inculcated, and how, through the mechanism of racism, black people end up emulating their oppressors.”^৫

অর্থাৎ, অবদমিত ও নিপীড়িত দেশজ মানুষদের জন্য কলোনিয়ালিজম তাদের অন্তঃকরণকে ধ্বংস করে দেয়। কলোনিয়াল শাসকরা দেশজ মানুষদের বারংবার অমানুষ বলে, নেতিভদের পিশাচ, পৌত্তলিক আদিম বলে উপস্থাপন করে। একটা দীর্ঘসময় ধরে দেশীয় মানুষজন এই মানসিক প্ররোচনার শিকার হয়। তাদের মধ্যে এক হীনমন্যতা বোধের সৃষ্টি হয় এবং তারা তখন তাকেই সত্যি বলে ধরে নেয়। যার ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে বিদেশীয়দের প্রতি এক আনুগত্য প্রদর্শিত হতে থাকে। আলোচ্য গল্পে হরকুমার নিজের ক্ষমতার আফালে নিজের গ্রামের প্রজাকে নায়ক ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের দরুণ শাস্তি

দেবার অভিপ্রায়ে নালিশ রুজু করতে উদ্যত হয় বিদেশীয় সাহেবদের এজলাসে। আবার সেই নায়েবই বিদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবকে তুষ্ট করতে তার কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করতে প্রয়োজন অতিরিক্ত জিনিস প্রেরণ করতে লাগলেন।

“নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য-শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আন্ডা ঘৃত দুগ্ধ জোগাইতে লাগিলেন। জয়েন্ট-সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যিক নায়েব মহাশয়, তদপেক্ষা অনেক বেশি অক্ষুন্নচিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন।”^৬

অর্থাৎ, জাতিগত ভাবে শ্রেষ্ঠ বিদেশি জাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের এক প্রতিচ্ছবি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই নায়েব মশাইকেই জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর কুকুরকে প্রয়োজনীয় ঘি না দেওয়ার অপরাধে সকল লোকের সামনে কান ধরে তাঁবুর চারিদিকে ঘোড়দৌড় করান। হরকুমার জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুরের মঙ্গলার্থে একাজ করেছে জানালেও সাহেব তাঁকে কোন মতে রেয়াত করেননি। তাঁর মেথরকে নির্দেশ দেন –

“এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও।”^৭

আবার এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শশিভূষণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নায়েবের হয়ে মামলা লড়তে চাইলে ও সেই মত প্রস্তুতি নিলেও নায়েব প্রথমে নিজ গাত্রদাহে অপমানে মামলা করতে রাজি হলেও পরবর্তীতে তাঁর সমস্ত ব্যাবস্থাপনাকে বাধাগল করে দিয়ে নায়েব হরকুমার সেই একই ভাবেই উর্ধ্বস্তন কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের কারণেই জয়েন্ট-ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আনা মকদ্দমাকে উঠিয়ে নেয়। এমনকি হরকুমারের অপমানের মোক্ষম জবাব দিতে যে শশিভূষণ ব্যবস্থা নিয়েছিল হরকুমারের বিদেশীয় আনুগত্য দেশীয় শশিভূষণকে গ্রাম ছাড়া করিতে বাধ্য করে।

এই একই ছবির পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় দ্বিতীয় ঘটনায়, যখন ইংরেজি স্টীমারের সাথে পাল্লা দিয়ে দেশি নৌকা পালের পরে পাল তুলে এগিয়ে যায়। ইংরেজ সাহেবের দেশি নৌকার এই প্রতাপকে মেনে নেওয়া ছিল কঠিন। তাই –

“যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং স্টীমারকে ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময় সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল।”^৮

এখানেও কাজ করেছে সেই জাত্যাভিমান। ব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

“ম্যানেজার কেন যে এমন করিলেন তাহা বলা কঠিন। ইংরেজনন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙ্গালি হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়তো দিশি পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয়তো একটা স্ব্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলি দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটি হিংস্র প্রলোভন আছে, ...নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; ...ইংরেজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুন সে কোনরূপ শাস্তির দায়িক নহে – এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবত প্রাণসংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।”^৯

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় লেখক ইংরেজিদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে ঠিক কীভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেখানে দেশীয়দের প্রাণের থেকেও তা বিশেষ আকারে প্রতিভাত হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে শশিভূষণ এগিয়ে এলে মবিদের বক্তব্য থাকে “নৌকা তো মজিয়াছি এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না।”^{১০} এমনকি এই মাঝিগণ জানত তাদের জন্য রক্ষনকাজে নিযুক্ত ব্যক্তি নৌকা ডুবে যাওয়ার পর আর জীবিত অবস্থায় তাদের সাথে নেই। তারপরও তারা ইংরেজ সাহেবের বিরুদ্ধে কোন প্রকার নালিশ জানাতে অসম্মত থাকে। এমনকি স্টীমারে উপস্থিত গ্রামের লোকেরাও বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে অসম্মত হয়। একমাত্র নায়ক শশিভূষণকে লেখক উপস্থাপন করেছেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসাবে। যে শুধুমাত্র বিদেশী ইংরেজ সাহেবদের প্রতি নয়, প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশীয় মানুষদের আনুগত্যের প্রতি। যার মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় লেখক যখন বলেন –

“দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন।”^{১১}

আবারও একই ভাবে তৃতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবের বোটকে আগাম সতর্ক করা সত্ত্বেও যখন সে বোট চলিয়ে দেয় এবং তাতে জেলেদের জাল ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিনা অপরাধেই জেলেদের সমস্ত জাল কেটে ফেলার আদেশ দেন তাঁর মল্লাদের। এরদরুন সাত-আটশো টাকার ক্ষতির সামিল হলেও তারা প্রতিবাদ করার পরিবর্তে পালিয়ে যায়। এই অবস্থায় শশিভূষণের লাগাম ছাড়া প্রতিবাদ দেখা যায়। যখন সে পাগলের মত সাহেবকে মারতে থাকে। ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন শশি পর্যাপ্ত দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষদের থেকেও যেন অধিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হিসেবে প্রতিভাত হয়। জেলেরা নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে নিতে সম্মত হয় কিন্তু শশিভূষণের পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য দিতে রাজি হয়না। শেষে রাজি হলেও নায়েবের হস্তক্ষেপে তারা সাক্ষ্য দেওয়া থেকে বিরত হয়। এমনকি জেলেদের সাক্ষ্য দেওয়ার দুঃসাহস সম্পর্কে নায়েবের বক্তব্য থাকে, -

“অপবিত্রজন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা।”^{১২}

এবং গল্পে দেখা যায় পরবর্তীতে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ফলতঃ শশিভূষণের পাঁচ বছর জেল হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিক্ষেত্রেই দেখা যায় যখন দেশীয় মানুষ এক তীব্র আনুগত্য প্রকাশ করে বিদেশীয় শাসক গোষ্ঠীর প্রতি। যার মূলে ছিল বিদেশিদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। এই বিষয়কেই পূর্বে উল্লিখিত চিন্তাবিদ ফানোনের ধারণায় ব্যাখ্যা করা যায়। যেখানে তিনি বলেন, কালো মানুষেরা নিজেদের পরিচয় ভুলে বারংবার নিজেদের অমানুষ বলে প্রতিপন্ন করে। এবং তার পিছনে সর্বত ভাবে কাজ করে এই নেটিভদের জন্য এই শব্দ ‘মানুষ’ হয়ে দাঁড়ায় শুধুই সাদা চামড়ার মানুষ। কারণ নেটিভ বা কালো মানুষেরা নিজেদের মানুষ বলে গণ্যই করে না। এবং তারা এই ধারণার বশবর্তী হয় যে শুধুমাত্র সাদা চামড়ার মানুষদেরই মূল্যবোধ রয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের জন্য নেটিভরা ছিল সর্বদাই নেতিবাচক আদিম, এবং তাদের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গল্পে এই ভাবধারার প্রকাশ প্রতিক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। যে কারণে নৌকাডুবি হয়ে জেলে-রাঁধুনি মারা গেলেও ইংরেজ সাহেবের সেই বিষয়ে কোন ঝঞ্জেপ থাকেনা। যাকে লেখক ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, যাদের নৌকা গেছে বা প্রাণ সংশয় হয়েছে তারা যে মানুষ বলে গণ্য হতে পারে এমন ভাবনা সাহেবে ম্যানেজারের মাথায় উপস্থিত হয়নি। এবং সেক্ষেত্রে বাকি জেলেরাও তার প্রতি নালিশ জানাতে অস্বীকার করে কারণ সেই জাতিগত। পরাধীন দেশবাসী শাসিত হয়েও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ জানানোর সাহস বা ইচ্ছে কোনটাই সঞ্চয় করে উঠতে পারেনা। কারণ নিজেদের প্রতি হীনমন্যতা। ক্ষমতালোভী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের যে স্বতঃস্ফূর্ততা তাই বারবার উঠে এসেছে গল্পে। যাকে গ্রামসি বলেছিল ‘হেজেমনি’। কাহিনির আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথ নায়ক শশিভূষণকে একমাত্র প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যে আগাগোড়াই সর্বক্ষেত্রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গেছে। কিন্তু কোন ভাবেই তাঁর প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয়নি। শোষিত মানুষের নির্বুদ্ধিতা, আনুগত্য, তোষামোদ, ভীরুতা, দাস্যবৃত্তি সবকিছুর কাছেই নতিস্বীকার করতে হয়েছে সাহসি শশিভূষণকে। তাঁর প্রতিবাদী সত্তা অবদমিত লাঞ্চিত হয়েছে তাঁরই দেশীয় মানুষদের হাতে। গল্পের নবম পরিচ্ছেদে সেই আক্ষেপই প্রকাশ পেয়েছে যখন শশিভূষণ তাঁর বাবাকে বলে -

“জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর, যদি সংসঙ্গের কথা বলতো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃত্ত্ব কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত - বাহিরে অনেক বেশি।”^{১৩}

বলাবাহুল্য শশিভূষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার অর্থে যেন নিজ ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ বলা যায় গল্পটিতে একটি বড় অংশ জুড়ে আছে ঔপনিবেশিক কালে ঔপনিবেশিতদের মনস্তত্ত্বগত আনুগত্যের প্রকাশ। যেখানে গল্পে একটি রোমান্টিক বাতাবরণ থাকলেও সেই প্রেক্ষাপট প্রকাশ লাভ করেছে, ঔপনিবেশবাদের মোড়কে একটি রাজনৈতিক আখ্যান।

Reference:

১. Said, Edward. *Culture And Imperialism*. New York: Vintage Books, June 1994. Print. Pg. 7
২. Said, Edward. *Culture And Imperialism*. New York: Vintage Books, June 1994. Print. Pg. 9
৩. Schwarzmantel, John. *The Routledge Guidebook to Gramsci's Prison Notebook*. New York : Routledge, first published 2015. Print, Pg. 70
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. গল্পগুচ্ছ ২য় খন্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, পৃ. ৩৪৪
৫. Markmann, Charles Lam. ed. *Black Skin White Masks*. United Kingdom: Pluto Press, 1st ed 1986, new ed 2008. Print, pg. x
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. গল্পগুচ্ছ ২য় খন্ড, কলিকাতা: বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, পৃ. ৩৪৮
৭. তদেব, পৃ. ৩৪৯
৮. তদেব, পৃ. ৩৫৯
৯. তদেব, পৃ. ৩৫৯-৩৬০
১০. তদেব, পৃ. ৩৬০
১১. তদেব, পৃ. ৩৬১
১২. তদেব, পৃ. ৩৬৬
১৩. তদেব, পৃ. ৩৬৬